ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর : ২০১৫

ইসলামী আইনে রোমান আইনের প্রভাব : একটি বিশ্লেষণ

ড. মাহফুজুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : *পাশ্চাত্যের কিছু মনীষী ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন। তাঁদের অনেকেই মনে করেন যে, ইসলামী আইন শুরুতেই ব্যাপকভাবে রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কিছু মনীষী এমন ধারণাও পোষণ করেছেন যে, আজকে যে আইন ব্যবস্থাকে ইসলামী আইন বলে দাবি করা হচ্ছে; তা আসলে রোমান আইনের ইসলামী সংস্করণ বৈ আর কিছু নয়। তাঁরা মূলত "প্রাচ্যে একসময় রোমান আইন বাস্তবায়িত ছিল, আর তা থেকেই ইসলামী আইনের উপর রোমান আইনের প্রভাব পড়েছে", "ইসলামী আইন ও রোমান আইনের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান", এমন কথা বলে তাঁদের উপর্যুক্ত দাবির পক্ষে কিছু যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টাও করেছেন। তাঁদের এ সব দাবি ও যুক্তি কতটুকু প্রামাণ্য ও যুক্তিসঙ্গত এবং কতটুকু ন্যায়ানুগ তা খুঁজে দেখাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এ প্রবন্ধে তাঁদের যুক্তিগুলো উপস্থাপন করে তা দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করে দেখা হয়েছে। এ প্রবন্ধে আলোচনা পর্যালোচনা ও সমালোচনা মূলক গবেষণা রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।]*

ভূমিকা

পাশ্চাত্যর কিছু মনীষী এবং কিছু প্রাচ্যবিদের ধারণা যে, ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা তার সূচনাকালেই ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সর্বপ্রথম এ ধারণা Dominico Gotleschi-কে তাঁর রচিত Manuale di diritto pubblico eprivato atlomano নামক গ্রন্থে পোষণ করতে দেখা যায়। তাঁর মতে ইসলামী আইন মূলত রোমান আইন থেকেই নেয়া। তাঁর এ বক্তব্যের পর পাশ্চাত্যে এ ধারণা ধীরে ধীরে ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তা স্পষ্ট করে বলেছেন, আবার কেউ কেউ এ মর্মে সন্দেহ পোষণ করেছেন। যাঁরা এ ধারণা পোষণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আইনবিদ নন; তাঁরা প্রাচ্যবিদ। Henri Hugues এর মতে 'ইসলামী আইন মূলত রোমান আইন।' তাঁর মতে রোমান আইনকে কিছুটা পরিবর্তন করে মুসলিম আইনবিদগণ ইসলামী আইন বলে উপস্থাপন করেছেন।[১]

---

* অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. C.A Nalino, *নাযারাতুন ফি 'ইলাকাতিল ফিকহিল ইসলামী বিল কানূন আর-রুমানী*, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ সম্পাদিত, *'হাল্ লিল-কানূন আর রুমানী আছারুন আলাল ফিকহিল ইসলামী ?'* দারুল বুহুস আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৩ খ্রি., পৃ. ৯-১০

এ প্রসঙ্গে 'সিল্ডন অ্যামাস' (Sildon Amus) তাঁর ইংরেজী ভাষায় রচিত 'Roman Civil Law' গ্রন্থে বলেন,

> সম্ভবত সত্য, বরং অবশ্যই সত্য বিষয় হচ্ছে যে, ইসলামী আইনের সাধারণ নিয়ম-নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলো আরবী পোশাকে প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্যের আইন ছাড়া অন্য কিছু নয়। ... আমার মনে হয়, রোমান আইনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, তাতে পঠিত আইন গ্রন্থগুলো, আর এই আইন বাস্তবায়নকারী বিচারালয়গুলো, বিচার বাস্তবায়নকারী প্রশাসকগণ, আর প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ, যাঁরা এ আইনের পঠন-পাঠনের কাজে লিপ্ত ছিল তাঁরা সকলেই যে সব দেশে ইসলামী আইন ব্যবস্থা এবং তার উন্নত চিন্তা ও বিধি-বিধানের উন্মেষ হয়েছে সে সব দেশে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এতদুভয়ের বিস্ময়কর মিলন ঘটেছিল। কখনো (মুসলিম আইনবিদরা) রোমান আইন ব্যবস্থার মূলনীতিগুলোর সমর্থন করেছেন, আবার কখনো তার বিরোধিতা করেছেন। আমরা এ সত্য নিয়ে চিন্তা করলে অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামী আইন ব্যবস্থা অতি সাধারণভাবে পরিবর্তিত রোমান আইন ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুত ইসলামী আইন ব্যবস্থা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্যের (বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের) কাছে রক্ষিত আইন ব্যবস্থার প্রতিভূ। যা আরব ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।[২]

অন্য দিকে এ দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে আধুনিক কোন কোন গবেষকের। ইরানের বাহায়ী ধর্মাবলম্বী আবুল ফাযল যার ফফুকদানী এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে 'ইউরোপীয়রা যে আইন ব্যবস্থাকে বর্তমানে রোমান আইন ব্যবস্থা বলে দাবি করছে তা মূলত ইসলামী আইন ব্যবস্থা হতে সংগৃহীত।'[৩]

---

২. ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, *তাছীরুল ফুকুক আর-রুমিয়া আলাল ফিক্হিল ইসলামী*, পৃ. ২৭-২৮;
من المحتمل أو باحرى من الضروري ، أن لاتكون الآصول المهمة والقواعد العامة من الحقوق الاسلامية شيئا غير حقوق الامبراطورية الرومية الشرقية في لباس عربي... ونرى أن المدارس للحقوق الرومانية ، والكتب الدراسية لها ، والمحاكم العدلية التي تطبق هذه القانون ، والحكام العدليين، والعمال والاداريين الذين انكبوا على دراسة هذه الحقوق كانو موجودين في البلدان التي نشأ فيها نظام الفقه الاسلامي بما فيه من الاحكام والافكار الراقية، وحيث يوجد مزيج عجيب : فأحيانا الموافقة وأحيانا المخالفة مع الاصول الآساسية للحقوق الرومية المتأخرة.فأذا فكرنا في هذه الحقيقة فلا بد من ان نصل الى النتيجة ان نظام الفقه الاسلامي لم يكن الا نظام الحقوق الرومية مع تغيير يسير جدا. وفي الحقيقة ... يظهر ان الفقه الاسلامي ليس الا نظام الحقوق الموجودة عند الامبراطورية الرومية الشرقية (البيزنطية) المطبقة على حاجات الادارة العربية (الاسلامسة)

৩. C.A Nalino, *নাযারাতুন ফি ইলাকাতিল ফিকহিল ইসলামী বিল কানূন আর-রুমানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০ ; গ্রন্থটির মূল টেক্সট আরবীতে আব্দুল জালিল সাআদের *'মুকাদ্দামাতুল কাওয়ানীন'* নামক গ্রন্থে রয়েছে। তা নিম্নরূপ

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরে মিসরের আরো অনেকেই ব্যক্ত করেছেন।[৪]

প্রাচ্যবিদদের দাবি

ইসলামী আইনের উপর রোমান আইনের প্রভাব সংক্রান্ত প্রাচ্যবিদদের বক্তব্য ও যুক্তি-প্রমাণের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তাঁরা মূলত তিনটি দাবি ও তার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন। দাবি তিনটি হলো:

ক. প্রাচ্যে রোমান আইন বাস্তবায়িত ছিল, আর তা থেকেই ইসলামী আইনের উপর তার প্রভাব পড়েছে।

খ. ইসলামী আইন একা আরবজাতির চিন্তাপ্রসূত নয়; তাতে ব্যাপকভাবে অন্য জাতির চিন্তা-ভাবনার ফসলও বিদ্যমান।

গ. ইসলামী আইন ও রোমান আইনের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

উপর্যুক্ত এই তিনটি কারণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা ইসলামী আইনের সূচনাকালেই ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

প্রাচ্যবিদদের এসব দাবি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত এবং কতটুকু দলীল-প্রমাণ নির্ভর, তা আমরা এ প্রবন্ধে পর্যালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

এক. প্রাচ্যে রোমান আইনের বাস্তবায়ন ও তার প্রভাব

প্রাচ্যবিদদের প্রথম দাবি হলো: রোমান আইন প্রাচ্যে বাস্তবায়িত হয়েছিল। ফলে এ আইনব্যবস্থা প্রাচ্যের মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাস ও সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু যে কোন আইন ব্যবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও সামাজিক প্রথার একটা প্রভাব থাকে; সেহেতু রোমান আইনের আলোকে গড়ে উঠা সামাজিক প্রথা ও অভ্যাসের একটা বড় প্রভাব ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ফকীহদের অজান্তেই ইসলামী

(أن القانون الذي يسميه الاوربيون روميا هو في الحقيقة مأ خوذ من الفقه الاسلامي.)

৪. দেখুন, *মুজাল্লা 'আর রিসালা*, ২২৬/২০; **১১১/১৩**

يا سيدي؛ فسرت في حديث عن الأوزاعي التأثر الروماني، بالتأثر بالثقافة والبيئة الذي لابد من تقديره؛ فكتبت تقول لي إن القانون الروماني الحديث مأخوذ من الفقه الإسلامي؛ وإذ ذاك قلت لك هذا الرأي قديم نشر في مصر ولا يؤثر في قولي. [مجلة الرسالة (**১১১/ ১৩**، بترقيم الشاملة آليا)]

وهي الطريقة التي نقلها الرومان في تشريع الألواح الاثنى عشر. لذا يمكننا أن نقول بحق أن القانون الروماني قد أخذ أيضاً مبادئ كثيرة عن القوانين المصرية في مختلف العصور بعد صبغها بصبغة رومانية. ولا غرو فقد بلغت القوانين المصرية إذ ذاك من الرقي ما جعل ديودورس الصقلي – وهو مؤرخ يوناني عاش في القرن الأول قبل الميلاد – يقول عنها: (إنها كانت جديرة بالإعجاب وأعجب بها العالم فعلاً) [مجلة الرسالة (২২৬/ ২০، بترقيم الشاملة آليا)]

আইনে ঢুকে পড়ে। এ দাবি ডেভিড সান্টিলানা (David Santillana) এর। তিনি তিউনিসিয়ায় ১৯৯০ সালে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত Avant-projet per un futuro codice civile e commerciale tunisino (তিউনিসিয়ার দেওয়ানী ও বাণিজ্যিক আইন প্রকল্প)' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এ অভিমত প্রকাশ করেন।[৫]

ডেভিড সান্টিলানা'র (D. Santillana) পর এ অভিমত প্রকাশ করেন মুহাম্মদ হাফিয সাবরী। তিনি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে মিসরে প্রকাশিত তাঁর المقارنات والمقابلات (তুলনামূলক আইন) নামক গ্রন্থে তাঁর এ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'রোমান আইন প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সাথে মিলে-মিশে উন্নত ও সুশৃঙ্খল হবার পর রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো এবং তার বাইরের দেশগুলোর আইন ব্যবস্থায় পরিণত হয়। অতঃপর তার বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতিগুলো ইহুদী আইনেও ঢুকে পড়ে। ঈসা আ.-এর জন্মের আগে এবং পরে রোমান কর্তৃক ইহুদী রাষ্ট্র দখল করে নেয়ায় এ ব্যাপারটি ঘটে। ইসলাম রোমান সাম্রাজ্যের অধীন রাষ্ট্রগুলো, যথা: সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকা, আলজেরিয়া, মরক্কো ইত্যাদি দেশগুলো যখন বিজয় করে নেয়; তখন সে সব দেশে রোমান আইন বাস্তবায়িত ছিল। তখন ইসলাম সে সব আইনের মধ্য হতে কিছু আইন বিলুপ্ত ঘোষণা করে আর কিছু আইন আত্মস্থ করে নেয়। এ কারণেই মু'আমালাহ তথা: দেওয়ানী, বাণিজ্য ও অপরাধ আইনের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের অধিকাংশ ধারাগুলো ইহুদী ও রোমান আইনের সাথে সাদৃশ্যশীল দেখা যায়।[৬]

ড. মা'রুফ আদ-দুয়ালিবী তাদের এ বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন,

> তাঁদের এ বক্তব্য আন্দাজ-অনুমান নির্ভর একটি দাবি। তা যে আন্দাজ-অনুমান নির্ভর একটি দাবি তা তাদের বক্তব্য হতেই প্রতীয়মান হয়। তারা বলেছেন, রোমান আইন মানুষের সামাজিক প্রথা ও অভ্যাসে পরিণত হয়; ফলে তা মুসলিম ফকীহদের অজান্তেই ইসলামী আইনে ঢুকে পড়ে। এটাই এ বক্তব্যের প্রথম দুর্বলতা ও অসারতা বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ কোন প্রাচ্যবিদ বা যারা এরূপ বক্তব্য দিয়েছেন তারা রোমান আইন ইসলামী আইনে কিভাবে ঢুকে পড়লো; তার কোন বিবরণ দিতে পারেন নি।[৭]

৫. দেখুন, মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আসারুহা ফিত্তাশরী আল-ইসলামী*, (ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ সম্পাদিত *'হাল লিল কানুন আর রুমানী তা'ছীরুন আলাল ফিক্হিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৬

৬. মুহাম্মদ হাফিয সবরী, *আল-মুকারানাতু ওয়াল মুকাবালাতু...*,

৭. ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আছারুহা ফিত্তাশরী আল-ইসলামী*, (ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ সম্পাদিত, *'হাল্ লিল-কানূন আর রুমানী আছারুন আলাল ফিকহিল ইসলামী)* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

ডেভিড সান্টালিনা নিজেই তার এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার পর প্রশ্ন করেন, কিভাবে তা ঢুকে পড়ল? তারপর জবাব দিতে গিয়ে বলেন, 'এ প্রসঙ্গে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো নিঃসন্দেহে অত্যন্ত লাভজনক।' অতঃপর তিনি বলেন, 'তবে এখানে সে বিষয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয়।'[৮]

তাঁদের এ বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, এ দাবি প্রমাণ বিহীন অনুমান নির্ভর একটি দাবি। তাছাড়া এ বক্তব্যের অসারতা ঐতিহাসিক দলীল-প্রমাণগুলোও প্রমাণ করে। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য এটাই যে,

ক) রোমান আইন আসলে কেবল রোমের অধিবাসী রোমানদের উপরই কার্যকর ছিল। অতঃপর সম্ভবত তা ইটালির অধিবাসী ল্যাটিনদের উপরও কার্যকর করা হয়েছিল। এদের ছাড়া রোম সাম্রাজ্যের অন্য কোন জাতি-গোষ্ঠীর উপর এ আইন কার্যকর করা হয় নি।

খ) যে সব অঞ্চলে পূর্ব থেকে উন্নত আইনব্যবস্থা কার্যকর ছিল সে সব অঞ্চলে রোমান-পরবর্তীকালের আইনব্যবস্থা কার্যকর করা হয় নি।

গ) সিরিয়া, ইরাক ও মিসরে প্রাচ্যের মিসরীয় ও কাল্‌দানীয় আইন ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। এ অঞ্চলগুলো মিসরীয় ও কাল্‌দানীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হত।[৯]

ঘ) পরবর্তীকালের রোমান আইন ব্যবস্থা বস্তুতপক্ষে প্রাচ্যের আইন ব্যবস্থার মত। কারণ তা নিজেই প্রাচ্যের আইন ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত। প্রাচ্যের আইন ব্যবস্থাকে তা প্রভাবিত করতে পারে নি।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচ্যবিদদের পূর্বোক্ত বক্তব্য ও ধারণা দলীল-প্রমাণ বিহীন এবং অনুমাননির্ভর একটি ধারণা। ঐতিহাসিক বাস্তবতার সাথে যা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কাজেই তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

আমরা তাঁদের প্রথম দাবি ও যুক্তি খণ্ডনের জন্য আর একটি ঐতিহাসিক সত্য এখানে উল্লেখ করতে চাই। যা তাঁদের অনুমান-নির্ভর দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত। সে ঐতিহাসিক সত্যটি হলো: যে সব দেশে রোমান আইনের সাথে ইসলামী আইনের মিলন ঘটেছে বলে ধারণা করা হয় এবং প্রথমোক্ত আইন ব্যবস্থার নিয়ম-নীতি দ্বিতীয়টিতে প্রবেশ করেছে বলে দাবি করা হয়; সেই দেশগুলো হলো: মিসর ও সিরিয়া। কারণ এ দুটি দেশে রোমান শাসনের পতন ঘটিয়ে ইসলামী শাসন প্রবর্তন করা হয়। মিসর সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে, মিসর রোমান সাম্রাজ্যের আওতাভুক্ত থাকলেও তাকে তখনও বিদেশ গণ্য করা হত। মিসরবাসীকে কখনো

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৯. প্রাগুক্ত পৃ. ৯৩

রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ণ নাগরিকত্ব দেয়া হয় নি। ফলে মিসরবাসী রোমান আইন দ্বারা শাসিত হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তবে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরটিকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছিল, এবং তা রোমান আইন দ্বারা শাসিত হবার অধিকার লাভ করেছিল। ফলে রোমান আইন সেখানে পূর্বে বিদ্যমান আইন ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। পূর্বের আইনকে রোমান আইন প্রভাবিত করতে পারে নি।[১০] অতএব প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তীকালে স্বয়ং রোমান আইনের উন্নয়ন ঘটেছিল প্রাচ্যের আইন ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসার ফলে।

ইসলামী যুগে মিসরে 'আহলুর রায়' বা যুক্তিবাদী হানাফী মাযহাবের উন্মেষ ঘটে নি। যদি তাই হতো তা হলে হয়তো রোমান আইন দ্বারা ইসলামী আইন প্রভাবিত হয়েছিল বলে দাবি করা যেত। মিসর ছিল এমন মাযহাবের দেশ, যে মাযহাবে কেবল কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করা হয়। কাজেই মিসরে যে মাযহাবের উন্মেষ ও বিকাশ হয়েছিল- অর্থাৎ শাফিয়ী মাযহাব; তাতে রোমান আইনের প্রভাব খুঁজতে যাওয়া অনর্থক বাতুলতা বৈ অন্য কিছু নয়। তাছাড়া মিসরে যে মাযহাবের বিকাশ হয়েছিল সে মাযহাবটির উন্মেষ হয়েছিল হিজায ও ইরাকে। অতঃপর তা মিসরে চলে যায়।[১১]

অন্যদিকে বৈরূত ও সূর ছাড়া সিরিয়াতেও রোমান আইনের প্রয়োগে ছিল না। বরং সিরিয়ায় রোমান আইনের অধিকার-বঞ্চিত থাকার ব্যাপারটি মিসর থেকে বেশি স্পষ্ট। কেবল সিরিয়ার দুটি উপকূলীয় শহর তথা বৈরূত ও সূর ছাড়া বাকি গোটা সিরিয়া রোমান আইনের প্রভাবমুক্ত ছিল।[১২]

সিরিয়ার উপকূলীয় শহর (বৈরূত ও সূর) যাতে রোমান আইন বাস্তবায়িত ছিল তা-ই রোমান আইনকে প্রভাবিত করে, রোমান আইন তাকে প্রভাবিত করতে পারে নি। ফিনিশীয়রা যদি রোমান আইনকে প্রাচ্যের আইন ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত করে থাকে; তাহলে বলতে হয় যে, ঐ সব উপকূলীয় সিরিয়ান শহরের প্রভাবটাই বেশি, যাতে রোমান আইন বিশেষভাবে বাস্তবায়িত ছিল। কারণ সে শহরগুলো ছিল রোম সাম্রাজ্যের উপর কালদানী, ফিনিশীয় প্রভাব বিস্তারকারী শহরের প্রাণ কেন্দ্র। ঐ শহরগুলোই এ অবস্থায় রোমান আইন ব্যবস্থার উপর প্রভাব সৃষ্টি করে রোমান আইন তার উপর প্রভাব বিস্তার করার পূর্বে।[১৩]

দুই আরব সাম্রাজ্য যেমন: গাস্‌সানী ও লিহয়ানী সাম্রাজ্য এবং কুফা শহরের উপর রোমান আইনের কোন প্রভাব পড়ে নি। সিরিয়ার পূর্বে অবস্থিত ছিল আরব গাস্‌সানী

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
১১. প্রাগুক্ত
১২. প্রাগুক্ত
১৩. প্রাগুক্ত

সাম্রাজ্য। এ শহরের শাসন ব্যবস্থায় তার নিজস্ব ঐতিহ্য প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। মূলত এ শহরটিই ছিল ইরানী শহর। উক্ত সাম্রাজ্যের পূর্বে দুই প্রধান নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল কালদানীদের আবাস এবং তাতে ছিল আরব লিহয়ানীদের সাম্রাজ্য। তারাও ছিল ইয়ামানী বংশোদ্ভূত।[১৪]

আর আরব লিহয়ানী সাম্রাজ্যের পূর্বে এবং ফুরাত নদীর পশ্চিম উপকূলে আরব কুফা শহরের অবস্থান। এ শহরের অধিবাসীগণ নিরেট ইয়ামানী আরব। এ শহরেই মূলত ইসলামী আইনের উন্মেষ ও উন্নয়ন ঘটেছে। আর তা ঘটেছে 'আহলুর রায়' বা যুক্তিবাদী মাযহাব গ্রহণকারী হানাফী ফকীহ্দের হাতেই। ব্যাপার যদি তাই হয়; তা হলে একথা বলা যে, এ দুই দেশে রোমান আইনের প্রভাব পড়েছিল; তা বাস্তবতা, যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনার বিপরীত। বিশেষত এ কারণে যে, পরবর্তী রোমান আইন প্রাচ্য প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখেছি যে, তা বৈরূত ও সূর শহরের সীমানা অতিক্রম করে নি। কেবল ঐ দুইটি শহরেই তার বাস্তবায়ন সীমাবদ্ধ ছিল।[১৫]

ইসলামী আইনের উন্নয়নে সিরিয়ার তেমন কোন প্রভাব ছিল না। ইতিহাস থেকে এমন কোন তথ্য জানা যায় না যে, সিরিয়াতে কোন স্বাধীন ইসলামী মাযহাবের উন্মেষ ঘটেছিল। কারণ ইসলামী আইনের উষালগ্নে সিরিয়া ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের মতাদর্শ অনুসারী মাযহাবের প্রভাবাধীন ছিল। যেমন হিজায তথা মক্কা-মদীনাও এ মতাদর্শের অনুসারী ছিল।[১৬] এ কারণেই সিরিয়ায়ও ইসলামী আইনের উন্নতি-অগ্রগতি এবং রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হবার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল না।

ইমাম 'আবদুর রাহমান আল আওযায়ী (৮৮-১৫৭ হি.) রহ. যার মাযহাব সম্পর্কে বলা হয় যে, তা একমাত্র মাযহাব, যার উন্মেষ সিরিয়াতে হয়েছে। সে মাযহাবটিও ছিল মুহাদ্দিসদের মতাদর্শ অনুসারী মাযহাব। এ মাযহাব ইরাকী আহলুর রায়ের মাযহাবের সামনে টিকে থাকতে পারে নি। ফলে এ মাযহাবটি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। এ মাযহাবের বিদায় নেয়ার সাথে সাথে রোমান আইনের কোন প্রভাব ইসলামী আইনের উপর থাকলেও তা প্রমাণ করার সমস্ত আশা ভরসার মৃত্যু ঘটেছে।[১৭]

প্রাচ্যবিদদের উপর্যুক্ত দাবি প্রসঙ্গে ড. হামিদুল্লাহ বলেন,

> এতে কারো মতভেদ নেই যে, নবী স. হলেন ইসলামী আইনের মূল উৎস। মানুষ আল-কুরআন পেয়েছে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছ থেকে। তাদের কাছে তিনিই তা নিয়ে এসেছেন। আর সুন্নাহ! তা তো মহানবী স.-এর কথা, কর্ম ও সমর্থনেরই নাম। সাথে

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৬

> আছে তাঁর সাহাবীদের কর্ম। রাসূলুল্লাহ্ স. গ্রিক, ল্যাটিন, এমন কি সুরিয়ানী ভাষার কিছুই জানতেন না। তিনি এসব ভাষা জানলে না হয় বলা যেত যে, তিনি ঐ সব ভাষার মাধ্যমে রোমান আইন সম্পর্কে অবগত হয়ে ইসলামী আইনকে তা দ্বারা প্রভাবিত করেছেন। তিনি তাঁর জন্মলগ্ন হতে মক্কাতেই ছিলেন। গোটা জীবন আরব উপদ্বীপেই কাটিয়েছেন। যা ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত। তিনি তাঁর পুরো জীবনটাই তাঁর নিজের গোত্রের সাথে হিজাযেই কাটিয়েছেন। আর তাঁর বাণিজ্যিক সফরকালে বাইজান্টাইন ভূমিতে যে সময় কাটিয়েছেন তাও ছিল অতি স্বল্প দিনের জন্য সংক্ষিপ্ত সফর। কয়েক দিনের বা কয়েক সপ্তাহের জন্য মাত্র। তিনি জীবনে দুইবার উত্তর ফিলিস্তিনে ব্যবসার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। প্রথমবার গিয়েছিলেন তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে মাত্র নয়-দশ বছর বয়সে।[১৮] আর দ্বিতীয় বার গিয়েছিলেন প্রায় চব্বিশ বছর বয়সে। এ সময় তিনি দুই বা তিন সপ্তাহের বেশি সেখানে অবস্থান করেন নি।[১৯]

এতদ্ব্যতীত মহানবীর সাহাবীদের মধ্যে রোমান আইনে বিশেষজ্ঞ কোন সাহাবীকেও দেখা যায় না। সুতরাং আমরা এ কথা বলতে বাধ্য যে, ইসলামী আইনের যেসব বিধান পবিত্র কুরআন বা হাদীস থেকে সরাসরি সংগৃহীত, তাতে রোমান আইনের কোন ধরণের প্রভাব নেই।

স্বভাবতই ইসলামী আইন প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজিক প্রথা ও অভ্যাস মত গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ মক্কার সমাজিক প্রথা- যেখানে নবী স.-এর জন্ম; আর মদীনার সামাজিক প্রথা- যেখানে নবী স. হিজরত করে গিয়ে জীবনের বাকি দশটি বছর অতিবাহিত করেছেন- অতঃপর আরব ভূমির সামাজিক প্রথার উপর ভিত্তি করে ইসলামী আইন গড়ে উঠেছে। আমরা আরব উপদ্বীপের কোথাও; ইয়ামান ব্যতীত যেখানে কিছু দিন হাবশীরা শাসন করেছে; সরাসরি বা কোন মাধ্যমে রোমান আইনের প্রভাব পড়ার কথা দেখতে পাই না। আরব উপদ্বীপের উত্তর প্রান্তে নামমাত্র বাইজান্টাইন শাসন দেখতে পাই। যেখানে বাইজান্টাইনরা তাদের আইন বাস্তবায়ন করেনি। রোমের ইতিহাসবিদগণ তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।[২০]

আরব ব্যবসায়ীরা, বিশেষত মক্কার ব্যবসায়ীরা বাইজান্টাইন দেশগুলোর বাজারগুলোতে প্রায়ই যেতেন। এ সব ব্যবসায়ী ইরাকের বাজারগুলোতেও যেতেন। যা কি-না তখন

১৮. ইবন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, খ. ২, পৃ. ৩৪৮ ;
لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها للتجارة ونزلوا بالراهب بحيرى .فقال لابي طالب بالسر ما قال .
১৯. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত্ তারীখ*, মিসর, ২য় সংস্করণ, ১৩০৩ হি., খ. ১, পৃ. ২৫০
২০. ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, *তাছীরুল হুকুক আর রুমিয়া আলাল ফিক্হিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

ইরানের (সাসানী শাসনের) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও তারা অন্যান্য বাজারেও ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাতায়ত করত। যদি বলা হয় যে, এসব ব্যবসায়ী রোমান আইনের কিছু চিন্তা-চেতনা ইসলামের আবির্ভাবের আগেই আত্মস্থ করে নিজের দেশে নিয়ে এসেছিল; তা হলে আমরা এ সম্ভাবনা পুরোপুরিভাবে উড়িয়ে দিতে চাই না। তবে তাদের এ দাবি যে, ঐ ব্যবসায়ীরা কেবল রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল; অন্যান্য দেশের আইনব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয় নি; এ কথা মেনে নেয়া যায় না। কারণ তা আসলে দলীল-প্রমাণ বিহীন একটি দাবিকে অগ্রাধিকার দান ছাড়া আর কিছুই নয়। যা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি মেনে নিতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ইসলামী আইনগুলোর প্রায় সব মাযহাব এমন সব স্থানে বেড়ে উঠেছিল যেখানে বাইজান্টাইনদের প্রভাব ছিল না; যেমন, হিজায ও ইরাকে। শিয়া মাযহাব সম্বন্ধে যেমন এ কথা সত্য; তেমনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মায্হাবগুলো সম্বন্ধেও সত্য। যাইদিয়া ও ইমামিয়া শিয়া মাযহাব দুটি এবং হানাফী ও মালিকী সুন্নী মাযহাব দুটি কুফা ও মদীনা শহরে বেড়ে উঠেছে। এ দুটি শহরেই ছিল নিরেট আরবী শহর। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আইনবিদ যিনি এসব মাযহাবের সমসাময়িক ছিলেন এবং বৈরূতে বসবাস করতেন তিনি হলেন ইমাম আবদুর রাহমান আল আওযায়ী রহ.। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিকে বৈরূতে কাটিয়েছিলেন, এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন। অবশ্য তার মাযহাবটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আর শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাব দুটিরও বাইজান্টাইন প্রভাবের বাইরে বাগদাদে উন্মেষ হয়। ইমাম শাফিয়ীর মিসরে অবস্থান তেমন বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে না। কারণ তা ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিকে তাঁর মাযহাব বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বাইরে প্রতিষ্ঠিত হবার পর। অর্থাৎ ইরাক এবং হিজাযে প্রতিষ্ঠিত হবার পর। সুতরাং তিনি মিসর যাবার পর তাঁর মাযহাবের উপর তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান আইনের প্রভাব পড়েছে এমন কথা বলা যায় না।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উমাইয়াদের রাজধানী দামেস্ক শহরটি বাইজান্টাইন এলাকাভুক্ত ছিল। তবে সে সময় দামেস্ক শহরে চর্চা হতো আল-কুরআন, আল-কুরআনের তাফসীর, হাদীস, আরবী সাহিত্য ও মেডিকেল সাইন্স। উমাইয়াদের যুগে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোন পূর্ব অঞ্চলে মুসলিম আলিমদের মধ্যে কেউ ইসলামী আইন চর্চা করতেন তেমন দেখা যায় নি। আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে নেয়। অতঃপর অল্প কিছু দিন দামেস্কে বসে দেশ শাসন করার পর রাজধানী দামেস্ক হতে বাগদাদে নিয়ে যায়। যা ছিল ইতঃপূর্বে ইরানী শাসনের অন্তর্ভুক্ত একটি শহর। যার চর্তুদিকে ছিল ইরানী কালচার, রোমান কালচার নয়। আব্বাসীয়দের আমলেই ইসলামী আইন চর্চার ধুম পড়ে। তখনই মুসলিম ফকীহগণ ইসলামী আইনের উপর ব্যাপকভাবে গবেষণা আরম্ভ করেন। অবশ্য এর

জন্য ধন্যবাদ দেয়া যায় আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফর আল-মানসূর (৭১৪-৭৭৫ খ্রি.)কে, যিনি তাঁর শাসনকালে (৭৪৫-৭৭৫ খ্রি.) ইসলামী আইন চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি ইমাম মালিক (৭১২-৭৯৫ খ্রি.) রহ-এর কাছে ইসলামী আইনের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন,

> আপনি এ দীনের জ্ঞান সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনা করুন। তাতে ইবনু ওমরের কড়াকড়ি আর ইবনু আব্বাসের সহজতা এবং ইবনু মাসউদের ব্যতিক্রমধর্মী মতামত পরিহার করুন। আর মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন। সাহাবা ও ইমামগণের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত অভিমতগুলো গ্রহণ করুন।[২১]

অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, খলীফা আবু জা'ফর আল-মানসূর খিলাফত গ্রহণ করার আগে এবং পরে অত্যন্ত জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান লোক বলে পরিচিত ছিলেন। তাই তিনি ইমাম মালিক রহ.-কে বলেছিলেন,

> হে আবু আব্দুল্লাহ! এই মাটির উপরে আপনার আর আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী আর কেউ বর্তমানে বেঁচে নাই। আমাকে খিলাফত ব্যস্ত রেখেছে। সুতরাং আপনি মানুষের জন্য এমন একটি গ্রন্থ রচনা করুন, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে পারবে। তাতে ইবনু আব্বাসের সহজতা আর ইবনু ওমরের কঠোরতা পরিহার করুন। আর তা মানুষের জন্য সহজেই অনুকরণীয় করে রচনা করুন। ইমাম মালিক বলেন, আল্লাহর কসম! তিনিই সে দিন আমাকে গ্রন্থ রচনার পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন।[২২]

অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খলীফা হারুন আর-রাশীদ (৭৬৬-৮০৯ খ্রি.) ইমাম মালিক রহ.-কে এ আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি গ্রন্থটিকে দেশের সমস্ত বিচারালয়ে বাস্ত বায়নের ইচ্ছাও পোষণ করেছিলেন।[২৩]

---

২১. যুরকানী, *মুকাদ্দামা শারহু মুআত্তা ইমাম মালেক*, খ. ১, পৃ. ৯

ضع هذا العلم ودوّن فيه كتاباً، وتجنب فيه شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود وأقصد أواسط الأمور وما أجمع عليه الصحابة والأئم

২২. *তারীখে ইবন খালদুন*, খ. ১, পৃ. ১৭-১৮

و قد كان أبو جعفر بمكان من العلم و الدين قبل الخلافة و بعدها و هو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموطإ يا أبا عبد الله إنه لم يبقى على وجه الأرض أعلم مني و منك و إني قد شغلتني الخلافة فضع أنت للناس كتاباً ينتفعون به تجنب فيه رخص ابن عباس و شدائد ابن عمر و وطئه للناس توطئة قال مالك فوالله. لقد علمني التصنيف يومئذ؛ (مقدمة ابن خلدون (١/ ٣٠))

২৩. দেখন, ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আস সাহওয়াতুল ইসলামিয়া বাইনা ইখতিলাফিল মাশরু ওয়াত তামাযযুক আল মাযমুম*, দারুশ শরুক, ২০০১ খ্রি., পৃ. ৭৪;

ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على "موطئه" في مثل هذه المسائل منعه من ذلك

আব্বাসীদের পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশিদা ও উমাইয়া যুগে আরব উপদ্বীপের বাইরে কুফা নগরী ছাড়া অন্য কোথাও ইসলামী আইন নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে বলে জানা যায় না। সে শহরটিও বাগদাদের কাছেই অবস্থিত। এ শহরটিও বাগদাদের মত রোমান প্রভাব মুক্ত ছিল। বরং রাজধানী বাগদাদের চেয়ে বেশি প্রভাব মুক্ত ছিল। কারণ কুফা হচ্ছে দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত মুসলিম সেনাবাহিনীর আবাসস্থল। বাণিজ্যিক নগরী হলে সেখানে ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক অঞ্চল ও এলাকা থেকে লোকজন আসত। ফলে রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হবার কিছুটা সম্ভাবনা থাকত।[২৪] কিন্তু কুফা শহরটি তা ছিল না। তা ছিল নিরেট একটি আরবী শহর, যা সম্পূর্ণভাবে রোমান প্রভাব মুক্ত।

দুই. ইসলামী আইন শুধু আরবজাতির চিন্তা প্রসূত নয়; তাতে ব্যাপকভাবে অন্য জাতির চিন্তার ফসলও বিদ্যমান

প্রাচ্যবিদদের দ্বিতীয় দাবি হলো: ইসলামী আইন একা আরবদের চিন্তা প্রসূত নয়; বরং তার উপর অন্যান্য জাতির চিন্তা-চেতনার প্রভাবও ব্যাপকভাবে পড়েছে।

তাঁদের মতে, ইসলামী আইন হিজরী দ্বিতীয় শতকে প্রায় পূর্ণতা লাভ করে সংকলিত হয়েছে এবং তা পূর্ণতা লাভ করেছে বৈরূত ও সিরিয়ায় অবস্থিত খ্রিস্টান আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক হবার ফলে। এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রফেসর Henri Masse তাঁর ফরাসী ভাষায় লিখিত L. Islam,'ল-ইসলাম' নামক গ্রন্থে।[২৫] মোট কথা আরবরা সিরিয়া এবং ইরাক বিজয় করার পর ঐসব দেশে পূর্ব থেকে বিদ্যমান খ্রিস্টান আইন বিদ্যালয়গুলোর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। আর সেখান হতেই ইসলামী আইনের উপর রোমান খ্রিস্টান আইনের প্রভাব পড়ে।

তাঁর এ বক্তব্য ও দাবি খণ্ডন করতে গিয়ে ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী বলেন,

> এ দাবিটিও ঐতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ আরবরা ইরাক ও সিরিয়া ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে বিজয় করে নেয়। এর প্রায় এক যুগেরও আগে গোটা রোমান সাম্রাজ্যে তিনটি আইন বিদ্যালয় ছাড়া আর কোন আইন বিদ্যালয় ছিল না।[২৬]

এ প্রসঙ্গে Collinet তার 'বৈরূতস্থ শিক্ষালয়ের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বলেন,

> সম্রাট Justinian (জাস্টিনিয়ান) গোটা রোমান সম্রাজ্যে তিনটি বিদ্যালয় ছাড়া অপর কোন সরকারী বিদ্যালয় রাখেন নি। দুটি বিদ্যালয় সাম্রাজ্যের দুটি বড় শহরে রোম ও কনেস্ট্যান্টিনোপলে অবস্থিত ছিল। আর তৃতীয়টি ছিল বৈরূতে।

২৪. ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, *তাছীরুল হুকুক আর রুমিয়া আলাল ফিক্‌হিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

২৫. Henri Masse, L. Islam, Paris, 1930, p. ৭২-৭৫ ; ড. হামিদুল্লাহর প্রাগুক্তগ্রন্থ হতে সংগৃহিত।

২৬. ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আছারুহা ফিত্‌তাশরী আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

> মিসরের 'আলেকজান্দ্রিয়া' এবং ফিলিস্তিনের 'কাইসারিয়া' শহরের বিদ্যালয় দুটি সহ অন্যান্য বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইতঃপূর্বে 'আসিনা' শহরের বিদ্যালয়টিও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।[২৭]

বৈরূতের বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল ১৬ই জুলাই ৫৫১ খ্রিস্টাব্দে এবং তা বন্ধ করা হয়েছিল একটি ভূমিকম্পনের পর বৈরূত শহরটি প্রায় ধ্বংস হয়ে যাবার কারণে। সে ভূমিকম্পনে তখন বৈরূতে প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) লোক মারা যায়। তাদের অনেকেই ছিল বিদেশী বনেদী পরিবারে ছাত্র। যারা আইন অধ্যয়নের জন্য বৈরূতে এসেছিল। এ ঘটনাটা ঘটে ছিল মহানবী স. এর ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করার প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে।[২৮]

প্রফেসর Collinet আরো বলেন,

> ৬০০ খ্রিস্টাব্দে বৈরূত শহরটি প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত ছিল। ফলে অত্যন্ত সহজেই তা ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের দখলে চলে আসে। তখনও বৈরূতে অবস্থিত আইন বিদ্যালয়টি পুনর্নির্মাণ করা হয় নি। অবশ্য বৈরূত ধ্বংস হবার পর পর বিদ্যালয়টি বৈরূত থেকে সরিয়ে 'সায়দা' শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। বৈরূত শহর পুনর্নির্মাণ করা হলে; সেখানে পুনরায় নিয়ে আসা হবে এ উদ্দেশ্যে।[২৯]

সুতরাং এ সব ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণ করে যে, 'আরবরা সিরিয়া এবং ইরাক বিজয়ের পর সেখানে প্রাপ্ত আইন বিদ্যালয়গুলোর সংস্পর্শে মুসলমানরা আসার পর ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে'- এ ধারণা একটি অলীক, কাল্পনিক, ভিত্তিহীন ধারণা। যা ঐতিহাসিক সত্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

তিন. ইসলামী আইন ও রোমান আইনের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান

প্রাচ্যবিদদের তৃতীয় দাবিটি হলো: ইসলামী আইন ও রোমান আইনের মধ্যে তিনটি বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান। বিষয় তিনটি হলো:

১. আইনের দর্শন।
২. আইনের ভাষা।
৩. আইনের পরিভাষা ব্যবহার।

ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত না হলে; এতদুভয় আইনের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য থাকার কথা নয়। অতএব ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত। এ

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত

অভিমত ব্যক্ত করেন D. Santillana, Goldziher ও H. Masse।[৩০] Ignaz Goldziher তার এই ধারণা তার Introducation to Islamic Theology and Law ('ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও আইন') নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন ।[৩১]

তাঁদের এ দাবি প্রসঙ্গে ড. 'মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী বলেন,

> তাঁদের এ দাবিটিও আন্দাজ-অনুমান নির্ভর, যার কোন প্রমাণ নেই। তাঁরা দাবি করেছেন, রোমান আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে সাদৃশ্য এ কারণেই হয়েছে যে, ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ইসলামী আইন রোমান আইন থেকে অনেক কিছু নিয়েছে। কিন্তু কি করে নিল, কিভাবে নিল এবং কোথায় কোন আইনটি নিল? এসব প্রশ্নের কোন জবাব তাঁদের কাছে নেই। তারা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারেন নি, ইসলামী আইনের এ ধারাটি রোমান আইনের অমুক ধারা থেকে নেয়া হয়েছে। কাজেই তাঁদের এ দাবিটিও একান্তই আন্দাজ-অনুমান নির্ভর, যার কোন সঠিক ভিত্তি ও প্রমাণ নেই।[৩২]

তাঁদের দাবি 'রোমান আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে'- এটি সব চেয়ে বড় কল্পনাপ্রসূত, আন্দাজ বা অনুমাননির্ভর একটি দাবি বলে প্রতীয়মান হয়। আমরা এ বিষয়ে এখানে পাঠকদের সামনে সংক্ষেপে আলোচনা পেশ করতে চাই।

যদি সত্যিই -তাঁদের দাবি মতে- দুই আইন ব্যবস্থার মধ্যে চিন্তা-দর্শন, ভাষার ব্যবহার এবং আইনের পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকে; তা হলে আমরা তা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাব তৃতীয় বিষয়ে অর্থাৎ পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আর তা এ কারণেই যে, দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষের প্রয়োজন, জীবনের বাস্তবতা এবং চিন্তা-চেতনার মধ্যে একটি ঐক্য বিদ্যমান। এটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অনিবার্য দাবি। আর এ কারণেই তাদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য দেখা যায়। এমনকি কেউ কারো কাছ থেকে ধার করে ভাষা ব্যবহার না করলেও। অবশ্য মানুষের চিন্তা চেতনার ঐক্যের কারণে ভাষা ব্যবহারে সাদৃশ্যের দিকে D. Santillanaও ইঙ্গিত করেছেন। তিনি ফরাসী আইন ও ইসলামী আইনের ভাষার মধ্যে বিরাট সাদৃশ্য দেখে বিস্ময় বোধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলেন,

৩০. ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আছারুহা ফিত্তাশরী আল-ইসলামী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৩১. Ignaz Goldziher, *Introducation to Islamic Theology and Law,* Princeton Nj : Princeton University Press,1981

৩২. ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

> আমরা যদি গভীরে প্রবেশ করি তা হলে আমরা মদীনা, কুফা ও কর্ডোভার মুসলমান আইনবিদদের চিন্তা-চেতনা এবং আমাদের (ফরাসী) আইনবিদদের চিন্তা-চেতনা এবং ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখতে পাব তা দেখে আমরা বিস্ময় অভিভূত হব।[৩৩]

আর উভয় আইন ব্যবস্থার পরিভাষায় সাদৃশ্যের ব্যাপারটি, একটি আইন ব্যবস্থা অপর আইন ব্যবস্থা হতে কিছু জিনিস নিয়েছে বলে সন্দেহের উদ্রেক করে। এ কারণেই এ জাতীয় সাদৃশ্য প্রসঙ্গে আমরা এখানে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই।

পরিভাষার সাদৃশ্য প্রসঙ্গে বিশেষ পর্যালোচনা

ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণ করেছে যে, রোমান আইনের শেষ সংস্করণে প্রাচ্যের বিরাট উপাদান ছিল। রোমান আইনের শেষ সংস্করণ হতে প্রাচীন রোমান আইনের সব মৌলিক পরিভাষা বাদ দেয়া হয়নি। বরং তার বিরাট একটা অংশ বাদ দেয়া হলেও অপর একটা অংশ নতুন সংস্করণে রেখে দেয়া হয়েছিল। কারণ পুরাতন মৌলিক পরিভাষাগুলোই প্রকৃতপক্ষে রোমান আইনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল।

সুতরাং রোমান আইনের এ প্রকারের পরিভাষাগুলো যে জাতির আইন ব্যবস্থায় পাওয়া যাবে; সে জাতির আইনব্যবস্থায় রোমান আইনের প্রভাব পড়েছে বলে মনে করার পক্ষে একটা বড় দলীল পাওয়া গেছে বলে আমরা মনে করতে পারব। অতঃপর তা প্রমাণ করার জন্য আমরা গবেষণায় লেগে যাব।

রোমান আইনের পরিভাষার প্রকার

রোমান আইনের পরিভাষাগুলো-তা পুরাতন রোমান আইনের হোক বা নতুন সংস্করণকৃত রোমান আইনের হোক- মূলত চার প্রকার:

এক. পুরাতন মৌলিক পরিভাষা, যা তারা শেষ সংস্করণের সময় বাদ দিয়েছে, সংরক্ষণ করে নি। এ ধরণের পরিভাষার সংখ্যা অনেক।

দুই. পুরাতন মৌলিক পরিভাষা, যার অর্থের কোন পরিবর্তন না করে নতুন সংস্করণে ব্যবহার করে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

তিন. পুরাতন মৌলিক পরিভাষা, যার কিছুটা অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন সংস্করণে ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

চার. নতুন সৃষ্ট পরিভাষা, যা কেবল রোমান আইনের শেষ সংস্করণে ব্যবহার করা হয়েছে।

আমরা প্রাচ্যবিদদের পেশ করা উদাহরণগুলোর দিকে তাকালে -যার সম্পর্কে তাঁরা দাবি করেছেন যে, উভয় আইনের এই পরিভাষাগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান-

৩৩. দেখুন, D. Santillana, *Code civil et Commercial Tunisien Avant Propos*, Tunis : 1899, p. xii

দেখতে পাই যে, প্রাচ্যবিদরা উভয় আইনের যে সব পরিভাষায় সাদৃশ্য আছে বলে দাবি করেছেন তার মধ্যে এমন একটি পরিভাষাও খুঁজে পাওয়া যায় না, যা প্রাচীন রোমান আইনে ছিল আবার ইসলামী আইনেও আছে। এমনকি ঐ পরিভাষাটি রোমান আইনের শেষ সংস্করণে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার ইসলামী আইনেও ব্যবহৃত হচ্ছে এমনটিও দেখা যায় না। তবে তাঁদের দাবি মতে যে সব পরিভাষায় সাদৃশ্য দেখা যায়; তা কেবল রোমান আইনের শেষ সংস্করণেই বিদ্যমান। এটা এক চরম বাস্তব সত্য এবং ভেবে দেখার মত বিষয়। এর কারণ উদঘাটন করাও জরুরী।

প্রাচ্যবিদরা দাবি করেছেন যে, রোমান আইন ইসলামী আইনের উপর নিঃসন্দেহে প্রভাব ফেলেছে। এ দাবিটি ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত একটি দাবি। কারণ তাঁরা আমাদেরকে বলতে পারেননি, কেন রোমান আইনের কেবল নতুন সংস্করণের নতুন পরিভাষা আর ইসলামী আইনের পরিভাষায় কিছুটা সাদৃশ্য বিদ্যমান? এ সাদৃশ্য প্রাচীন রোমান আইনের একটি পরিভাষাতেও নেই কেন?

আমরা যদি তাঁদের আন্দাজ বা অনুমানকে উপেক্ষা করি, যার সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে বলেছি যে, তা ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত- এমতাবস্থায়ও আমরা এ সন্দেহ দূর করার জন্য ঐতিহাসিক সত্যটা কি? যদি তা উদঘাটন করতে পারি; তবে তাঁদের এ সন্দেহ দূর করা এবং তার ব্যাখ্যাদান আমাদের পক্ষে সহজতর হবে। তাঁদের জবাব দানও সম্ভবপর হবে।

ঐতিহাসিক সত্যটি হলো: রোমানরা ভূমধ্যসাগর অধ্যুষিত অঞ্চল বিজয় করে নেয়ার পর সেখানে রোমান আইনের নতুন সংস্করণ বাস্তবায়ন করে। আর এ সময় রোমান আইন প্রাচ্য প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। আমরা আরো জানি যে, ইসলামী আইনেও প্রাচ্যের প্রভাবের বিষয়টি একটি মৌলিক বিষয়।

প্রাচ্যের অঞ্চলগুলো বিজয় করে নেয়ার পর রোমান আইনে প্রাচ্যের অনেক উপাদান ঢুকে পড়ে এবং সে উপদানগুলো ছিল মানুষের জীবনাচরণ, সামাজিক প্রথা এবং প্রাচ্যের বিদ্যমান আইন ব্যবস্থা থেকে অর্জিত। আর এই জীবনাচরণ ও সামাজিক প্রথাই হলো ইসলামী আইনেরও অন্যতম মূল ভিত্তি। এ কারণেই উভয় আইনের যে সব পরিভাষায় সাদৃশ্য দেখা যায়; তা কেবল রোমান আইনের নতুন সংস্করণের পরিভাষার সাথে সম্পৃক্ত। প্রাচীন রোমান আইনের কোন মৌলিক পরিভাষার সাথে ইসলামী আইনের কোন পরিভাষার সাদৃশ্য দেখা যায় না।

ঐতিহাসিক সত্য সমর্থিত এ ব্যাখ্যা প্রমাণ করে যে, রোমান আইনের কোন প্রভাবই প্রাচ্যের জীবনাচরণ ও সামাজিক প্রথায় পড়ে নি। সুতরাং তা পরবর্তীকালে ইসলামী আইন ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলেছে এমন ধারণা একটি ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রাচ্যবিদরা ইসলামী আইনের ব্যাপারে যেরূপ বাড়াবাড়ি করেছে; আমরা রোমান আইনের ব্যাপারে সেরূপ বাড়াবাড়ি করতে চাই না। আমরা বলতে চাই না যে,

রোমান আইনের নতুন সংস্করণে প্রাচ্যের জীবন আচরণ ও সামাজিক প্রথার ভিত্তিতে যেসব নতুনত্ব এসেছে সেটা নিঃসন্দেহে প্রাচ্যের প্রভাব। বরং প্রফেসর সান্টিলিনা কখনো কখনো যে রূপ বক্তব্য ও অভিমত গ্রহণ করেছেন আমরা সেরূপ অভিমতই গ্রহণ করতে চাই। আমরা বলতে চাই, আমাদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় মানুষের মাঝে যে চিন্তাগত ঐক্য দেখা যায়; তার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করতে হবে। মানুষের মধ্যকার চিন্তাগত ঐক্য হয়ে থাকে জীবনের প্রয়োজন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। যা প্রায় সব জাতির মধ্যে একই রকম হয়ে থাকে, এর বিপরীত হতে দেখা যায় না।

আমরা যদি প্রাচ্যবিদদের এ দাবিটি যে, 'উভয় আইন ব্যবস্থার পরিভাষাগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।' এর তাৎপর্য উদঘাটনের দিকে গভীরভাবে নজর দেই, তাহলে দেখতে পাব যে, এ দাবির সত্যতা কেবল আভিধানিক অর্থের ক্ষেত্রে বিদ্যমান, পরিভাষাগত অর্থে এ দাবির সত্যতা দেখা যায় না।

আমরা এ বিষয়টাকে আরো বোধগম্য ও পরিষ্কার করার জন্য এখানে পাঠকদের সামনে উদাহরণ স্বরূপ এমন দুটি পরিভাষা পেশ করতে চাই, যে দুটি পরিভাষার মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলে তাঁরা দাবি করেছেন। যাতে পাঠক বুঝতে পারেন যে, বাকি পরিভাষাগুলোর ব্যাপারও ঠিক একেই রকম। কারণ এখানে সব পরিভাষা নিয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। পরিভাষা দুটি হলো: ইসলামী পরিভাষা 'ইজমা' আর রোমান পরিভাষা 'Consensus'।

১. ইজমা ও Consensus শব্দদ্বয়ের পর্যালোচনা

'ইজমা' শব্দটি ইসলামী আইনের একটি পরিভাষা। আর Consensus শব্দটি রোমান আইনের একটি পরিভাষা। Consensus শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ। প্রাচ্যবিদরা দাবি করেছেন যে, এই উভয় শব্দের তাৎপর্যের মধ্যে একটি সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয় শব্দ আইনবিদদের ঐকমত্য বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়।'[৩৪]

রোমান আইনের Consensus বা ঐকমত্য সম্মন্ধে প্রফেসর A.E.Giffard বলেন,

> যখন বলা হয়; এ ব্যাপারে একাধিক আইনবিদ রয়েছেন। তখন এর মানে হয়, এ বিষয়ে আইনবিদদের একাধিক পরস্পর বিরোধী অভিমত রয়েছে। এসব পরস্পর বিরোধী অভিমতের মধ্য হতে কোন অভিমতটি গ্রহণ করতে হবে, আর কোন অভিমতটি বাদ দিতে হবে, সে ব্যাপারে বিচারালয় অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়ে যেত। এ কারণেই সম্রাটের পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এতদুদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করা

৩৪. Henri Masse, *L. Islam*, Paris, 1930, p. 72-75; ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহর প্রাগুক্ত গ্রন্থ হতে সংগৃহিত।

হলো; আর আইন সংস্কার করে সংশোধনী আনা হলো; যাতে বিচার সংক্রান্ত একটি অভিমতকে বিধিবদ্ধ করা যায়।[৩৫]

অর্থাৎ কোন এক বিষয়ে আইনবিদদের বিভিন্ন ধরণের পরস্পর বিরোধী অভিমত থাকলে সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যেমে তা থেকে একটি অভিমতকে সম্রাট কর্তৃক অগ্রাধিকার দিয়ে বিধিবদ্ধ আইন বলে স্বীকৃত দানই হলো রোমান আইন মতে Consensus বা ঐকমত্য।

সংশোধন ও সংস্কার প্রক্রিয়ার স্তর

সম্রাটের পক্ষ হতে আইন সংস্কার করে যে সংশোধনী আসলো সে প্রসঙ্গে প্রফেসর A.E.Giffard বলেন, 'সংশোধন ও সংস্কার প্রক্রিয়া ক্রমান্নয়ে চার যুগে এবং চার স্তরে নিম্নরূপে সম্পন্ন করা হয়েছিল।'

এক. প্রথম সংস্কার প্রক্রিয়া সম্রাট অগাস্ট (Auguste) এর যুগ ২৭ খ্রিস্টাব্দ পূর্ব থেকে শুরু হয়ে সম্রাট হাডরিয়ান (Hadrian) এর যুগ ১১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে।

দুই. দ্বিতীয় সংস্কার প্রক্রিয়া হাডরিয়ানের যুগ থেকে সম্রাট কনেস্ট্যানটাইন (Constantine) এর যুগ পর্যন্ত চলে। (অর্থাৎ ১১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলে।)

তিন. তৃতীয় সংস্কার প্রক্রিয়া সম্রাট কনেস্ট্যানটাইন (Constantine) এর যুগ থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় Theodore ও তৃতীয় Valentinien এর যুগ পর্যন্ত চলে।

চার. চতুর্থ সংস্কার প্রকিৃয়া দ্বিতীয় Theodore এর যুগ থেকে তৃতীয়Valentinien এর যুগ পর্যন্ত চলে।[৩৬]

সম্রাট অগাস্ট এর সংস্কার প্রসঙ্গে কথা হলো: ইতঃপূর্বে ধর্মীয় ব্যপারে রাষ্ট্রের অনুমোদন ও তত্ত্বাবধান ছাড়াই ধর্মীয় আইনবিদরা স্বাধীনভাবে তাদের আইনী অভিমত ব্যক্ত করে থাকতেন। যখন সম্রাট অগাস্ট ক্ষমতায় আসলেন তখন তিনি এ ক্ষমতা কয়েক জন আইনবিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিলেন। আর তা করা হয়েছিল যাতে নানা অভিমত সৃষ্টি না হয়; ঐকমত্যের ভিত্তিতে রায় দেয়া যায়। আর তখন থেকেই জাতির নামে আইনের ব্যাখ্যা জারী হতে থাকে।

সম্রাট হাডরিয়ান এর যুগের সংস্কার সম্মন্ধে কথা হলো: ইতঃপূর্বে যে কয়জন আইনবিদকে আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতা দেয়া হয়ে ছিল তা সম্রাটকে এক পর্যায়ে উৎকণ্ঠায় ফেললো। তিনি মনে করতে থাকলেন, আইন ব্যাখ্যাকারীদের আইনের

৩৫. A.E.Giffard, Precis do Droit Romain, T.I, art.93, Paris : 1933, p.53,

৩৬. ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আছারুহা ফিত্তাশরী আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, (ড. হামিদুল্লাহর গ্রন্থ) পৃ. ১০৮

ব্যাখ্যা তার বিশেষ ক্ষমতায় বাধাঁ সৃষ্টি করছে। এ কারণেই সম্রাট হাডরিয়ান উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন করলেন। তিনি দেশের বিখ্যাত আইনবিদদেরকে তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য করে নিলেন। তিনি তার আইনবিদদের পরামর্শক্রমে নিজেই আইনের ব্যাখ্যা দান শুরু করলেন।[৩৭]

সম্রাট হাডরিয়ান এর পর উপদেষ্টা পরিষদের আইনের ব্যাখ্যাদানকারী সদস্যগণ সম্রাটের তত্ত্বাবধানে থেকে আইনের ব্যাখ্যাদানের বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করলেন। তাঁদের লিখিত গ্রন্থগুলোর অভিমত আদালতে উদাহরণ ও দলীল হিসেবে পেশ করা হতে থাকল। তাদের সকলের ঐকমত্য তখন থেকে আইন হিসেবে গণ্য হতে থাকলো।[৩৮]

এভাবেই রোমান আইনে Consensus বা ঐকমত্যের বিকাশ ঘটলো। এবং এর পশ্চাতে উদ্দেশ্য ছিল আইনবিদদের মতানৈক্য নিরসন করা। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম, কিভাবে রোমান আইনে Consensus বা ঐকমত্যের উদ্ভব ঘটল।

অতঃপর সম্রাট কনেস্ট্যানটাইন ক্ষমতায় আসলে তিনি আইনের ব্যাখ্যা দানের ক্ষমতা ও অধিকার একা তার নিজের হাতেই তুলে নিলেন। যার ফলে আইনবিদদের আইনের ব্যাখ্যাদানের আর কোন আইনত অধিকার থাকল না। তাঁরা আইনের ব্যাখ্যা দিলে তাঁদের সে ব্যাখ্যার কোন আইনী মূল্যও থাকল না। তবে অতীতের আইনবিদদের আইনের গ্রন্থগুলোর দীর্ঘ দিন থেকে যে বিচারিক ক্ষমতা ছিল; তাও বাকি রাখা হল। পরবর্তী সম্রাটদের যুগে তা সরাসরি আইন গ্রন্থের মর্যাদাও লাভ করল।[৩৯]

সম্রাট Theodore ও Valentinien যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন; তখন তারা ৪২৬ খ্রিস্টাব্দে তাদের সেই বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় ফরমানটি জারী করলেন। যাকে পরবর্তীতে Procedure Law বা আদালতে আর্জি পেশ করা সংক্রান্ত আইন বলা হয়। এ ফরমানটি জারী করা হয়েছিল আইনবিদরা তাঁদের প্রণীত আইন গ্রন্থে যেসব বিষয়ে মত বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল সেসব মত বিরোধ নিরসন কল্পে এবং বিচারকদের বিচার কাজে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে।[৪০]

উপরোক্ত ফরমান বা আইনটিতে আইনবিদদেরকে দুটি দলে বিভক্ত করা হয়েছিল:

প্রথম দল : প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন পাঁচজন আইনবিদ, তাঁরা হলেন, Gaious, Papinien, Modestin, Ulpien, Paul; আইনে এই পাঁচজন আইনবিদকে

৩৭. A.E.Giffard, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, খ. ১, পৃ. ৫৪, প্যারা. ৯৪; ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আছারুহা ফিত্তাশরী আল-ইসলামী*, (প্রাগুক্ত ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহর গ্রন্থ), পৃ. ১০৮

৩৮. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, পৃ. ১০৮

৩৯. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, পৃ. ১০৯

৪০. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

পরিপূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয় এবং বিচারকের সামনে তাঁদের অভিমতকে দলীল হিসেবে পেশ করার সুযোগও দেয়া হয়।[৪১] এখানে আরো উল্লেখ্য যে, এসব আইনবিদ সম্রাটের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যও ছিলেন।

দ্বিতীয় দল : দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ঐসব আইনবিদ, যাঁদের গ্রন্থ থেকে প্রথম দলের আইনবিদগণ তাঁদের অভিমত নিয়েছেন এবং তাঁদের লেখনিতে সে কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এই দ্বিতীয় দলের অভিমতকে দলীল হিসেবে পেশ করার জন্য শর্তারোপ করা হয়েছিল যে, অবশ্যই তাঁদের গ্রন্থ সাথে করে আদালতে নিয়ে আসতে হবে। তাঁদের গ্রন্থের দুস্প্রাপ্যতা তাঁদের অভিমতকে দলীল হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধক ছিল। কার্যত তাঁদের অভিমত দ্বারা দলীল দান সম্ভবপর ছিলনা। কেবল তখনই তাঁদের অভিমত দ্বারা দলীল দেয়া যেত; যখন প্রথমোক্ত দলের গ্রন্থে তাদের অভিমত উল্লেখ থাকত।[৪২]

এসব আইনবিদ যাঁদের অভিমতকে আদালতে দলীল হিসেবে পেশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল তাঁদের ঐকমত্যকে আইনী মূল্যও দেয়া হয়েছিল। তাঁদের অভিমতের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে তখন কী করা হবে সে প্রসঙ্গে থিওডর বলেন, তখন বিচারকদের অধিকাংশের অভিমত গ্রহণ করতে হবে। আর যদি পরস্পর বিরোধী দুটি অভিমত পাওয়া যায় এবং প্রতিটি অভিমতের পক্ষে একাধিক আইনবিদের অবস্থান দেখা যায়; তখন অবশ্যই যে পক্ষে Papinien এর অভিমত আছে, বিচারককে সে অভিমতটিই গ্রহণ করতে হবে। এসব বক্তব্য উপস্থাপনের পর Giffard বলেন, এভাবেই বিচারকার্য Procede macanique বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চলতো। অভিমতগুলোর গণনা করা হতো; মূল্যায়ন করা হতো না।[৪৩]

এ পর্যন্ত রোমান আইনের Consensus বা ঐকমত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এবার নিম্নে ইসলামী আইনের ইজমা সম্মন্ধে আলোচনা পেশ করা হলো :

ইসলামী আইনে ইজমা

ইসলামী আইনের প্রধান চার উৎসের তৃতীয় উৎসটি হলো 'ইজমা'। ইসলামী আইনের সে উৎসগুলো হলো: কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ স., ইজমা ও কিয়াস।[৪৪]

---

৪১. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, পৃ. ১১০

৪২. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১১১

৪৪. আলী ইবন মুহাম্মদ আল বাযদাভী, *উসূলুল বাযদাভী*, পৃ. ৫; তিনি বলেন,

أعلم أن أصول الشرع ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع والأصل الرابع القياس بالمعنى المستنبط من هذه الأصول

ইজমার সংজ্ঞা ও প্রামাণিকতা

ইজমা'র আভিধানিক অর্থ ঐকমত্য। ইসলামী আইনবিদদের পরিভাষায় ইজমা বলতে বুঝানো হয়, রাসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তিকালের পর কোন এক যুগের সমস্ত মুজতাহিদ কর্তৃক ইসলামী আইন শাস্ত্রের কোন এক বিষয়ের হুকুম সম্বন্ধে ঐকমত্যে উপনীত হওয়া।[৪৫]

ইসলামী আইনে ইজমার ধারণাটি এসেছে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও নবী স.-এর কয়েকটি হাদীস থেকে, আমরা এখানে পাঠকদের সামনে তা পেশে করছি:

১. আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের 'উলুল আমরের'। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর; তা হলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষদিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।[৪৬]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উপর কোন ব্যাপারে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের ফয়সালা না থাকলে; তখন সে ব্যাপারে ফয়সালার জন্য 'উলুল আমরের' শরণাপন্ন হতে আদেশ করেছেন। 'উলুল আমর' বলতে সম্মানের অধিকারী লোকদের বুঝানো হয়েছে। সাধারণত মানুষ দুই কারণে সম্মানের আধিকারী হয়। এক. দুনিয়াবী ক্ষমতার কারণে। দুই. ধর্মীয় জ্ঞানের কারণে। দুনিয়াবী ক্ষমতার কারণে যাঁরা সম্মানিত হয়, তারা হলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী শাসক শ্রেণীর লোকেরা। আর ধর্মীয় জ্ঞানের কারণে যারা সম্মানিত হন তাঁরা হলেন মুজতাহিদ ও ফকীহ আলিমগণ। ইবনু আব্বাস র. উপর্যুক্ত আয়াতে 'উলুল আমর' বলতে মুজতাহিদ আলিম-উলামাকে বুঝিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উপর আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, ন্যায়পরায়ণ শাসক শ্রেণি ও মুজতাহিদ আলিমদের অনুসরণ করা ফরয করে দিয়েছেন।

কাজেই যে সব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর সরাসরি ফয়সালা নেই, সেসব ক্ষেত্রে মুমিনদেরকে মুজতাহিদ আলিম-উলামাদের অনুসরণ করতে হবে। আর যদি কোন বিষয়ের হুকুমের ব্যাপারে মুজিতাহিদগণ ঐকমত্যে উপনীত হন; তখন তার আনুগত্য ও অনুসরণ করা এবং সে হুকুম মেনে নেয়া উম্মাতের উপর ফরয হয়ে পড়ে। একারণেই আল্লাহ তাআলা এ সূরার অপর এক আয়াতে বলেছেন,

---

৪৫. আব্দুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, *ইলমু উসুলিল ফিক্হ*, কুয়েত : দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৫

৪৬. আল-কুরআন, ০৪ : ৫৯

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾

আর যদি তারা সমস্যাটি রাসূলের কাছে এবং তাদের উলুল আমরের (তথা জ্ঞানী-গুণী মুজতাহিদদের গোচরে আনত) তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা সমাধান উদ্ভাবন করতে পারে তারা সমস্যার যথার্থ সমাধান জানতে পারতো।[৪৭]

মোটকথা, মুজতাহিদ আলিমগণই সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীস থেকে বের করতে পারেন। সুতরাং সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁদের কাছে যেতে হবে এবং তাঁদের দেয়া সমাধান সানন্দে গ্রহণ করতে হবে।

২. আল্লাহ তা'আলা অপর এক আয়াতে যারা আল্লাহর রাসূল ও মুমিনদের বিরুদ্ধাচরণ করে ভিন্নপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে বলেন,

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾

আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।[৪৮]

আলোচ্য আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যারা ঈমানদারদের পথ তথা মুজতাহিদ আলিম-ওলামাদের পথ পরিহার করে অন্য পথে চলে তাদেরকে নবীর বিরুদ্ধাচরণকারীদের সমান অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা হারাম। যেহেতু মুজতাহিদদের পথ হলো ঈমানদারদের পথ; সেহেতু তাঁদের ইজতিহাদের মাধ্যমে ঐকমত্যে উপনীত হওয়া হুকুমের আনুগত্য করা ফরয, আর তাদের ঐ ঐকমত্যের বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম।

৩. শরীয়তের কোন হুকুমের ব্যাপারে মুজতাহিদদের ঐকমত্য মানে প্রকৃত পক্ষে এ ব্যাপারে গোটা উম্মতের ঐকমত্য। কারণ মুজতাহিদগণই হলেন শরী'আত সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলিম। তাঁরাই হলেন গোটা উম্মাতের প্রতিনিধি। কাজেই তাঁদের অভিমতের মাধ্যমে গোটা উম্মাতের অভিমতের প্রতিফলন হয়। আর রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কতিপয় হাদীস থেকে জানা যায়, এ উম্মাত সামষ্টিকভাবে সব সময় ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকবেন। সুতরাং মুজতাহিদদের ঐকমত্যও ভুল-**ভ্রান্তির** ঊর্ধ্বে বলে পরিগণিত হবে, আর তার অনুসরণ করা আবশ্যক ও ফরয সাব্যস্ত হবে। কারণ:

ক) রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সাহাবী আবু বাসরাহ্ আল-গিফারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

৪৭. আল-কুরআন, ০৪ : ৮৩
৪৮. আল-কুরআন, ০৪ : ১১৫

عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : سألت ربي عز و جل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة سألت الله عز و جل ان لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها وسألت الله عز و جل ان لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها وسألت الله عز و جل ان لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها

আমি আমার রবের কাছে চারটি জিনিস চেয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে তিনটি দান করেছেন আর একটি দান করতে অস্বীকার করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছিলাম, আমার উম্মাত যেন গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ না হয়। তিনি তা আমাকে তা দান করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছিলাম তিনি যেন তাদেরকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন, যেমন পূর্বের উম্মাতদের ধ্বংস করেছেন। তিনি তাও আমাকে দান করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছিলাম তিনি যেন তাদেরকে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত না করেন, এক দল অপর দলের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা তা আমাকে দান করতে অস্বীকার করেন।[৪৯]

খ) ইবন আব্বাস রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন 'আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতকে গোমরাহী বা বিভ্রান্তিতে ঐক্যবদ্ধ করবেন না।'[৫০]

গ) ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'আমার উম্মাত কখনো গোমরাহীতে একমত হবে না। সুতরাং তোমাদেরকে জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে। কারণ আল্লাহর সাহায্য জামা'আতের সাথেই থাকে।'[৫১]

ঘ) ইবন উমর রা. হতে অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আল্লাহ উম্মতকে কখনো গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর সাহায্য জামা'আতের সাথে থাকে। সুতরাং তোমরা বড় দলের অনুসরণ করো। কারণ যে জামা'আত থেকে বের হয়ে একাকী হয়ে পড়বে তাকে একাকী জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৫২]

৪৯. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৬, হাদীস ২৭২৬৭; শুআইব আরনাউত বলেন: এ হাদীসের সনদ দুর্বল হলেও মূলত হাদীসটি অন্যান্য সনদের কারণে সাহীহ লিগাইরিহী।
৫০. *মুসনাদে রাবী ইবন হাবীব*, ১০৩, পৃ. ৩৬ হাদীস নং ৩৯;
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال
৫১. তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, খ. ১১, পৃ. ৭৮, হাদীস নং ১৩৪৪৮;
عن ابن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لن تجتمع أمتي على الضلالة أبدا , فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة.
৫২. হাকিম, *আল-মুস্তদরাক*, খ. ১, পৃ. ১১৫, হাদীস নং ৩৯১;
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ

ঙ) আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাত গোমরাহীর উপর একমত হবে না। যখন তোমরা মতবিরোধ দেখবে তখন তোমাদেরকে বড় দলের সাথে থাকতে হবে।[৫৩]

ইজমার উদ্দেশ্য

ইসলামী আইনে ইজমার উদ্দেশ্য হলো নবী স. কর্তৃক সকলের ঐকমত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ঘোষণা এবং আইনী বিষয়ে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত হয়; তাকে আইনী মর্যাদা দান।

ইসলামী আইনে ইজমার এই উদ্দেশ্যের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ইসলামী আইন ও রোমান আইনের Consensus এর উদ্দেশ্যের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।

১. ইসলামী আইনের ইজমা ও রোমান আইনের Consensus এর মধ্যে প্রথম পার্থক্যটি হলো: রোমান আইনে Consensus বা ঐকমত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, সম্রাট ও তার সাংসদবর্গের ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ এবং অন্যদের অভিমতকে মর্যাদাহীন ও ক্ষমতাহীনকরণ। এ উদ্দেশ্যটি ইসলামী আইনের ইজমার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

২. ইসলামী আইনের ইজমা ও রোমান আইনের Consensus এর মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্যটি হলো: ইসলামী আইনের ইজমা সংঘটিত হবার জন্য কোন দল বিশেষ বা যুগ বিশেষের প্রয়োজন হয় না, যে কোন যুগেই মুজতাহিদদের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইজমা সংঘটিত হতে পারে। তেমনিভাবে কোন দলের মধ্যে কোন ব্যক্তি বিশেষ থাকলে সে দলের অভিমতকে অন্য দলের অভিমতের উপর অগ্রাধিকার দানের মত ব্যবস্থাও ইসলামী আইনে নেই। ইসলামী আইনে ইজমার ধারণাটি এসেছে যাতে প্রতিযুগে ফকীহগণের মধ্যে ঐকমত্যের সৃষ্টি হয় সে উদ্দেশ্যে। এটাই ইসলামী আইনের ইজমা ও রোমান আইনের Consensus এর মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য এবং এই পার্থক্য উভয় আইন ব্যবস্থার সূচনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

৩. ইসলামী আইনের ইজমা ও রোমান আইনের Consensus এর মধ্যে তৃতীয় পার্থক্য হলো; আইনবিদদের মাঝে কোন ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টি না হলে; তখন রোমান আইনে অধিকাংশ আইনবিদের অভিমতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আর

الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا وَقَالَ : يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ

৫৩. খাতীব বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ১, পৃ. ৪৬৮, হাদীস নং ৪১৫;
عن أنس ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تجتمع أمتي على ضلالة ، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم

ইসলামী আইনে দলীল-প্রমাণ পর্যালোচনা করে যে পক্ষের দলীল বেশি শক্তিশালী ও বেশি যুক্তিপূর্ণ হয়; সে অভিমতটিকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

৪. ইসলামী আইনের ইজমা ও রোমান আইনের Consensus এর মধ্যে চতুর্থ পার্থক্যটি হলো : ইসলামী শরী'আহ্র অন্যতম ব্যাখ্যাদাতা হানাফী ফকীহ্গণের মতে, কোন বিষয়ে ইজমা চারভাবে সংঘটিত হতে পারে।

এক : সকলের ঐকমত্যে;
দুই : কর্মের ঐক্য বা সকল ফকীহ একই ধরনের কর্ম করলে তখনও ইজমা সংঘটিত হতে পারে।
তিন : কোন ফকীহ্র প্রদত্ত অভিমত সম্বন্ধে বাকী সকল ফকীহ অবগত হয়ে নীরবতা অবলম্বন করলে।
চার : কোন ফকীহ কোন কাজ করলে; আর বাকী ফকীহ্গণ সে ব্যাপারে অবগত হয়ে কোন অভিযোগ বা আপত্তি না করলেও ইজমা সংঘটিত হতে পারে।[৫৪]

ইজমা সংঘটিত হওয়ার উপর্যুক্ত চারটি পদ্ধতি হলো ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য। রোমান আইনে এ ধরনের ঐকমত্যের কোন অস্তিত্ব নেই।

ইসলামী আইন ও রোমান আইনের ঐকমত্যের উপর্যুক্ত তুলনা দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয় যে, আসলে প্রাচ্যবিদদের দাবি অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে উভয় আইনের ঐকমত্যের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য বিদ্যমান নেই। না মূল ভিত্তিতে, না উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে, না সংঘটিত হবার পদ্ধতিতে। তবে উভয় আইন ব্যবস্থার ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে আভিধানিক অর্থে কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; এ থেকে প্রমাণ করা যায় না যে, পরিভাষাগত সাদৃশ্যও উভয় আইনব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। এটাও প্রমাণ করা যায় না যে, ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, প্রাচ্যবিদদের তৃতীয় দাবিও দলীল বিহীন, আন্দাজ-অনুমান নির্ভর একটি দাবি, যার কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই, নেই কোন ঐতিহাসিক সত্যতা।

মোটকথা, ইসলামী আইন আদৌ রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত নয়। ইসলামী আইন কোনো ক্ষেত্রেই রোমান আইন থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করেনি, ইসলামী আইন তার নিজস্ব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তার আইনী উৎস হতেই সকল ইসলামী আইন সংগৃহীত।[৫৫] ইসলামী ফিক্হশাস্ত্রের পাঠকবৃন্দ এ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

৫৪. ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আছারুহা ফিত্তাশরী আল-ইসলামী*, (প্রাগুক্ত ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহর গ্রন্থ), পৃ. ১১৩

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১৪

এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ বলেন,

> এ ব্যপারে সন্দেহ নেই যে, ল্যাটিন তথা রোমান আইন ও ইসলামী আইনের পরিভাষায় কিছুটা সাদৃশ্য বিদ্যমান। যেমন: ফিক্হ ও Zurisprudentia, ফাতাওয়া ও responsa prudentiun, মুফতি ও Zurisconsultus, ইজমা ও Consensus, আদত বা অভ্যাস ও Usus, মদীনাবাসীর সামাজিক প্রথা ও Consuetudo populi Romani, শরী'আহ্ বা আইনের কারণ ও ratioLegis, রায় ও opnno, ইস্তিসলাহ বা জনকল্যাণ ও Salus populi ইত্যাদি।[৫৬]

এখানে যে বিষয়টি তাৎপর্যের দাবিদার তা হলো: যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ভূগোল, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও কালাম শাস্ত্রের বিপরীতে ফিক্হশাস্ত্রে আমরা ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষা থেকে আরবীকৃত কোন পরিভাষা দেখতে পাই না। এমন কি ফিক্হ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের উদ্ভবকালে মুসলিম ফকীহ্দের দ্বারা প্রাথমিক পর্যায়ে লিখিত ফিক্হ গ্রন্থগুলোতেও মূল রোমান শাস্ত্র থেকে সংগৃহীত কোন পরিভাষা আমরা দেখতে পাই না। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, বিদেশী উৎস থেকে গৃহীত স্বল্পসংখ্যক শব্দ ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রে রয়েছে। তবে তার অধিকাংশই ফার্সী ও আরামী ভাষার শব্দ। এ শব্দগুলোও প্রায় বাণিজ্যিক আইন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: চেক, দাহ্দাওয়ায্দাহ্ ও সফ্তাজা ইত্যাদি। তবে প্রতীয়মান হয় যে, এ শব্দগুলো ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগ থেকেই আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। মোট কথা, এ শব্দগুলোও ল্যাটিন বা গ্রিক নয়।

আমরা ইতঃপূর্বে যেসব আরবী শব্দের সমার্থবোধক ল্যাটিন শব্দ উল্লেখ করেছি; সে আরবী শব্দগুলো প্রায় সবই আল-কুরআন থেকে সংগৃহীত। এমন কি ফিক্হ শব্দটিও। এ শব্দটি ইসলামী আইন অর্থে আল-কুরআনেই ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৭] আমরা এখানে বলতে চাই যে, আইনের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান শরীক। ল্যাটিনরাই যদি এসব শব্দ আবিষ্কার করে থাকেন; তা হলে অন্যান্য আদম সন্তানরাও এসব শব্দ ব্যবহার করবে তাতে আপত্তির কি আছে?

আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থনে আরো বলা যায় যে, এ শব্দগুলো ইসলামী আইন ও রোমান আইনে প্রায় সমার্থে ব্যবহৃত হলেও এগুলোর বাহ্যিক শব্দগত অর্থেই কেবল সাদৃশ্য বিদ্যমান; তাৎপর্য ও প্রকৃত পারিভাষিক অর্থে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন: ইসলামী আইনের ইজমা ও রোমান আইনের Consensus শব্দের প্রকৃত তাৎপর্যে কোন সম্পর্ক নেই। তেমনিভাবে মদীনাবাসীর সমাজিক প্রথা (উরফু

৫৬. ড. হামীদুল্লাহ, *তা'ছীরুল হুকুক আর রুমিয়া আলাল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৫৭. ফিক্হ শব্দটি আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

আহলিল মাদীনা) ও রোমান Consuetudo populi Romani এর তাৎপর্যের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। মদীনাবাসীর সমাজিক প্রথা প্রকৃত পক্ষে মদীনাবাসীর আমল নয়। মদীনাবাসীর আলাদা কোন মর্যাদা ইসলামী আইনে নেই। আসলে যেসব ইসলামী আইনবিদগণ মদীনাবাসীর আমলকে ইসলামী আইনের উৎস গণ্য করেছেন তাঁরা কেবল এ কারণেই তাকে ইসলামী আইনের উৎস বলে গণ্য করেছেন যে, তা নবী মুহাম্মাদ স.-এর সমর্থন লাভ করেছে। নবী স. যখন মদীনাবাসীর এসব সামাজিক প্রথার প্রচলন তাঁদের মধ্যে দেখেছেন, তখন তিনি তার সমর্থন করেছেন। সুতরাং তা নবী স.-এর সমর্থনের কারণেই (সুন্নাহ বলে পরিগণিত হয়ে) ইসলামী আইনের উৎস হবার যোগ্য হয়েছে। মদীনাবাসীরা নবী স.-এর সমর্থনকৃত এসব সামাজিক প্রথা পরবর্তীতেও তাদের সমাজ জীবন ও জীবনাচরণে বাকি রেখেছেন। অতঃপর অন্যান্য মুসলিমরাও যে সব এলাকায় নবী স. বাস করেননি সে সব এলাকায়ও তা বাকি রেখেছেন।[৫৮]

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ফিৎয জিরাল্ড (Ftz Gerald) তাঁর Moammedan Law নামক গ্রন্থে বলেন,

> যখন কোন জাতি অপর কোন জাতি হতে কোন চিন্তা-দর্শন গ্রহণ করেন; তখন সাধারণত দেখা যায় যে, ঐ চিন্তা-দর্শন বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত বিদেশী শব্দসহ তা গ্রহণ করেন। যেমন: Hypotheca অর্থাৎ ঋণ, Cheirographa অর্থাৎ স্বাক্ষর সম্বলিত চুক্তিপত্র, Syngrapha অর্থাৎ একেই সাথে সকল পক্ষের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করণ, Emphyteusis অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ইত্যাদি শব্দ যা রোমান আইনে ব্যবহৃত হয়, তা উচ্চারণ করার সাথে সাথেই বুঝা যায় যে, তা গ্রিক ভাষা থেকেই নেয়া হয়েছে।[৫৯]

অনুরূপভাবে 'তালমুদ'[৬০] আইনেও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষাকে আরবী ভাষাকরণ করা হয়েছে ব্যাপকভাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আরবী ভাষা অন্যান্য ভাষার মত বিদেশী শব্দ ধার করার মুখাপেক্ষী হয় না। (কারণ আরবী ভাষা এমন এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভাষা, যার অভ্যন্তর থেকেই নতুন প্রয়োজনীয় শব্দ সহজেই সৃষ্টি করা যায়।) এতদসত্ত্বেও আরবী ভাষাও কখনো কখনো বিদেশী শব্দ ধার করেছে।

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হলো: দামেস্কের উমাইয়া খলীফারা- যাঁরা এ দেশটিকে নতুনভাবে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য এবং তাকে

৫৮. ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, *তা'ছীরুল হুকুক আর রুমিয়া আলাল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮

৫৯. S.V. Ftz Gerald, *Moammedan Law*, আদ্দাইন আল মায়যূমুনিল কানুনর রুমানী আলাল কানূন আল ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৬০. ইহুদীদের ধর্মীয় ও আইন গ্রন্থ।

সাম্রাজ্যের রাজধানী বানাবার জন্য সামরিক ও বেসামরিক অনেক কিছু করেছিলেন- তাঁরাও রোমান চিন্তা দর্শনের অনেক কিছু আরবী সমাজে বাকি রেখেছিলেন। আরবী ভাষায় ব্যবহৃত স্বল্প শব্দ এর প্রমাণ বহন করে। এসব শব্দের মধে কিছু কিছু শব্দ প্রথম বারের মত ব্যবহৃত হয়েছে। আর কিছু কিছু শব্দ এমন কি আল-কুরআনেও রয়েছে। তবে ইসলামী আইন প্রণেতা ফকীহ্গণ মদীনা এবং কুফা শহরের এসব খলীফাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ তারা ইসলামের আনুগত্য করত নামে মাত্র। খলীফারা নিজেরা এবং তাদের অনুসারী গভর্নররা ইসলামী আইনের প্রতি তেমন গুরুত্বারোপ করত না। সুতরাং এ কথা বললে কিছুতেই অত্যুক্তি হবে না যে, ঐ সব খলীফা কিছু গ্রহণ করলেও তাই যথেষ্ট ছিল ইসলামী ফকীহগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য না হবার জন্য।

অন্য দিকে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক যিম্মিদেরকে মুসলিমরা তাদের নিজেদের আইন দ্বারা তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধান করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাই তাদের আইনের কোন পরিভাষাও মুসলিম আইনে ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েনি। ... এ কারণেই আমরা ইসলামী আইনের বিরাট পরিভাষার ভাণ্ডারে একটি শব্দও ল্যাটিন বা গ্রিক ভাষা হতে সংগৃহীত হয়ে ব্যবহৃত হতে দেখি না।[৬১]

ইসলামী আইনের ইবাদত সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও রোমান আইন

ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত না হবার আর একটি বড় প্রমাণ হলো; ইসলামী আইনের গ্রন্থগুলোর এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে ইসলামী ইবাদাত সংক্রান্ত বিধি-বিধান। এই অংশটিও অন্যান্য অংশের মত একই ধরনের দলীল-প্রমাণ নির্ভর। এই অংশটি রোমানদের ধর্মীয় উপাসনা দ্বারা প্রভাবিত একথা স্বয়ং প্রাচ্যবিদরাও দাবি করেননি। কারণ মুসলিমরা এক আল্লাহ্য় (তাওহীদে) বিশ্বাসী। তাই ইসলামের ইবাদাত বন্দেগীও এই তাওহীদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কাজেই মুসলিমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদাতই করেন। আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করেন না। একারণেই মুসলিমদের ইবাদতে শির্কের অবকাশ থাকে না। মুসলিমরা এক আল্লাহর ইবাদত করেন, তাও কোন মনগড়া পদ্ধতিতে নয়, বরং রাসূলুল্লাহ্ স. যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে নিজে ইবাদত করেছেন এবং যেভাবে যে পদ্ধতিতে ইবাদত করতে সাহাবীদেরকে শিখিয়েছেন সে পদ্ধতিতেই। কারণ রাসূলুল্লাহ্ স. সালাত সম্পর্কে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 'তোমরা আমাকে

৬১. S.V. Ftz Gerald, *Moammedan Law, আদ্দাইন আল মায়যূমুনিল কানুনর রুমানী আলাল কানূন আল ইসলামী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯

যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ সেভাবেই সালাত আদায় করো।'[৬২] অনুরূপভাবে হজ্জ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ 'তোমরা তোমাদের হজ্জের নিয়ম কানুনগুলো আমার কাছ থেকে শিখে নাও।'[৬৩]

অন্য দিকে গ্রিকরা ছিলো পৌত্তলিক। তারা বহু রকমের দেব-দেবীর পূজা করত। আর রোমানরা ছিলো খ্রিস্টান। তারাও আল্লাহর সাথে ঈসা আ.-এর পূজা করত। কাজেই ইসলামী ইবাদত কিছুতেই গ্রিক ও রোমানদের ইবাদতের সাদৃশ্য হতে পারে না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ স. বহু ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের বিরোধিতা করতে আদেশ করেছেন।[৬৪] সুতরাং ইসলামী ইবাদতের বিধি-বিধান রোমান বা গ্রিকদের ইবাদতের বিধি-বিধান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। যদি ইসলামী আইনের ইবাদত সংক্রান্ত বিধি-বিধানগুলো অন্য কোন আইন দ্বারা প্রভাবিত না হয়; এবং অন্য কোন আইনব্যবস্থা থেকে সংগৃহীত না হয়; তা হলে ইসলামী আইনের বাকী অংশের বিধি-বিধানগুলো কেন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হবে?

তুলানামূলক ফিক্হশাস্ত্রের অধ্যয়ন

যাঁরা তুলানামূলক ইসলামী ফিক্হ অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, ফিক্হশাস্ত্রের প্রত্যেকটি মাসআলা বা বিধান আল-কুরআন থেকে বা নবী স.-এর সুন্নাহ থেকে বা কুরআন-হাদীস নির্ভর কোন যুক্তি বা কিয়াসের আলোকে বা মাসালিহে মুরসালা বা ইস্তিসহাবে হাল বা পূর্বের নবীদের শরী'আহত বা ওরফ

৬২. বুখারী, *আস সহীহ*, অধ্যায় : কাইফা কানা বাদয়ুল ওয়াহী, পরিচ্ছেদ : আল আযানু লিল মুসাফিরি ইযা কানু জামা'আতান ওয়াল ইকামাতু, খ. ১, পৃ. ১৬২, হাদীস নং-৬৩১

৬৩. বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : হজ্জ, পরিচ্ছেদ : ঈদাযে ফি ওয়াদিয়ে মুহাস্সার, খ. ৫, পৃ. ১২৫, হাদীস নং-৯৭৯৬

৬৪. রাসুল সা. বায়হাকী কর্তৃক শু'আবুল ঈমানে খ. ৫, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং ৩৫০৯; ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলেন:" خَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ 'তোমরা ইহুদীদের বিরোধিতা করো, (মুহাররম মাসের) নবম ও দশম দিন রোজা রাখো।'; সুনানে আবু দাউদের খ. ১, পৃ. ১৭৬, হাদীস নং- ৬৫২ বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলেন: خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ» 'তোমরা ইহুদীদের বিরোধিতা করো, তারা তাদের জুতা-স্যান্ডেল নিয়ে সালাত আদায় করে না; (তোমরা তা নিয়ে সালাত আদায় করো।) নাসির উদ্দিন আলবানী এ হাদীসটি সাহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম বুখারী, সাহীহ বুখারীতে খ. ৭, পৃ. ১৬০, হাদীস নং- ৫৮৯২; ইবন ওমর থেকে বর্ণনা করেন, নবী সা. বলেছেন:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

"তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো। দাড়ি লম্বা করো, আর গোঁফ ছোট করো"।

(সামাজিক প্রথা) ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ সব বিষয় পর্যালোচনা করলে ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হবার এ দাবিটি যে একটি হাস্যকর দাবি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তুলনামূলক ফিক্‌হ অধ্যয়নকারীরা অবশ্যই একথাও জানেন যে, ইসলামী আইনের অধিকাংশ আইন আসলে নবী মুহাম্মাদ স.-এর সুন্নাহ হতেই সংগৃহীত। বাকি কিছু ইসলামী আইন মুসলিম মুজতাহিদ ও ফকীহ্‌দের কুরআন-সুন্নাহ ও কিয়াস ভিত্তিক ইজতিহাদের ফসল ছাড়া আর কিছু নয়।

আইন বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য

অনেক মুসলিম ও অমুসলিম আইন বিশেষজ্ঞও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ইসলামী আইনের উপর রোমান আইনের কোন প্রভাব পড়েনি। শুধু তাই নয়; বরং ইসলামী আইন ব্যবস্থা অনেক দিক থেকে রোমান আইনের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। আমরা এরূপ কয়েকজনের সাক্ষ্য এখানে পাঠকদের সামনে পেশ করছি:

মিসরের আইন কলেজের প্রাক্তন প্রফেসর ড. আলী বাদাবি ইউরোপীয় আইনের প্রথম উৎস রোমান আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে তুলনা করার পর বলেন, 'অনুরূপভাবে ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী আইনের ফৌজদারী দণ্ডবিধি সম্পূর্ণ স্বাধীন। বরং এ আইন অন্যান্য পুরাতন ও আধুনিক অনেক আইনের উপর নানান দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। যেমন:

ক) আল-হিসবা ব্যবস্থা: এটি অতীতের একটি সামাজিক দাওয়াতী দায়িত্ব পালনকারী সংস্থা। একে বর্তমান যুগের গণ প্রতিনিধিদের দায়িত্বের সাথে তুলনা করা যায়।

খ) তাযিরী শাস্তি দানের ব্যবস্থা: অর্থাৎ শাস্তির পরিমাণ ও প্রকার নির্ধারণের দায়িত্ব বিচারকের উপর ছেড়ে দেয়া, যাতে বিচারক অপরাধের অবস্থা, অপরাধীর মানসিকতা, অপরাধের প্রতি তার ঝোঁকপ্রবণতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন। এ ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামী আইন ব্যবস্থাতেই বিদ্যমান। বর্তমানকালে অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি তুলছেন। যাতে অপরাধীদেরকে আইনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিশীল শাস্তিদান সম্ভবপর হয়। এ কারণেই চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে, ইসলামী শরী'আহত বা আইন ব্যবস্থায় শাস্তিদানের এমন সব বুনিয়াদী ব্যবস্থা ও নীতিমালা সম্বলিত, যা প্রশস্ততা ও সুবিচারের দিক দিয়ে মানবরচিত আইনের সর্বাধুনিক বুনিয়াদী ব্যবস্থা ও নীতিমালার চেয়ে কিছুতেই কম নয়। ইসলামী শরী'আতে এমন নীতিমালাও বিদ্যমান; রোমান শাস্তিবিধানে যার কোন নজীর আদৌ নেই।[৬৫]

ড. শফীক সাহ্‌হাতা তার 'আন-নাযারিয়াতুল আম্মা লিল ইল্‌তিযামাত ফিশ শারী'আহ' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২০১ পৃষ্ঠায় বলেন,

৬৫. *আইন ও অর্থনীতি* নামক সাময়িকীর প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা।

> আইন ব্যবস্থার মূলের দিক দিয়ে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামী শরী'আহ্ মূলনীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে রোমান আইনের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী। যেমন: তার একটি মূলনীতি হলো, একমত হওয়ার সাথে সাথে মালিকানা পরিবর্তন হওয়া। দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, ইচ্ছার ক্ষমতা সংক্রান্ত। আর তৃতীয় মূলনীতি হলো, চুক্তিগত প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত।[৬৬]

প্রফেসর ড. আব্দুর রায্‌যাক সানহুরী ও ড. হাশমত আবু সিত্তিত তাঁদের প্রণীত 'উসুলুল কানুন' (আইনের মূলনীতি) নামক গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠায় বলেন,

> ... ইসলামী শরী'আহ্ উন্নতি লাভের ক্ষেত্রে রোমান আইনের পথ অবলম্বন করে নি। রোমান আইন- পূর্বে যেমন বলেছি- অভ্যাস ও প্রথা হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে, অতপর দাবি ও বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রমোন্নতি ও বৃদ্ধি লাভ করে। অন্য দিকে ইসলামী আইন একটি অবতীর্ণ কিতাব ও আল্লাহর দেয়া অহীর মাধ্যমে তার সূচনা হয়। অতঃপর যুক্তি সংগত কিয়াস ও বাস্তব আহকামের পথ ধরে উন্নতি ও বৃদ্ধি লাভ করে। মুসলিম ফকীহ্‌গণ রোমান আইনবিদদের উপর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন ভিন্ন ধরনের সাধারণ মূলনীতি ও উসূল প্রণয়নের মাধ্যমে। অর্থাৎ উৎস হতে আহকাম সাব্যস্ত বা আহকাম বের করার নিয়ম-কানুন প্রবর্তন দ্বারা। এসব নিয়ম-কানুন সম্বলিত বিষয়কে বলা হয় 'উসূলে ফিক্‌হ' বা উসূল শাস্ত্র।[৬৭]

আন্তর্জাতিক আইন সম্মেলনের সাক্ষ্য

ইসলামী আইন যে রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত নয়; তা শুধু আমরা মুসলিমরা দাবি করছি ব্যাপারটি কেবল তাই নয়; বরং কিছু কিছু আন্তর্জাতিক আইন সম্মেলনেও তা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

১৩৫৬ হি: মোতাবেক ১৯৩৭ খ্রিস্টীয় সনে ভিয়েনার লাহাই শহরে তুলানামূলক আইনের ওপর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়কে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সে সুবাদে তাতে দুইজন প্রখ্যাত আজহারী আলিম আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরা তাতে দুটি প্রবন্ধও পাঠ করেন। তার একটি হলো: (المسئولية المدنية الجنائية في الشريعة الاسلامية) 'ইসলামী শরী'আতের ফৌজদারী ও দেওয়ানী দায়িত্ব'। অপরটি হলো: (استقلال الفقه الاسلامي ونفي كل صلة مزعومة بين الشريعة الاسلامية والقانون الروماني) 'ফিকহী ইসলামীর পূর্ণ স্বকীয়তা ও ইসলামী শরীয়তের সাথে রোমান আইনের ধারণাপ্রসূত সম্পর্ক নিরসন'।

৬৬. দেখুন, ড. ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি., পৃ. ১১৩

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

উক্ত সম্মেলনে পাশ্চাত্যের আইনজীবীদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তাতে বলা হয়:

ক. ইসলামী শরী'আহ্‌কে সাধারণ আইনের একটি উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

খ. ইসলামী শরী'আহ্ জীবন্ত এবং ক্রমোন্নতি যোগ্য।

গ. ইসলামী শরী'আহ্ স্বাধীনভাবেই বিস্তৃতি লাভ করেছে, অন্য কোন আইন ব্যবস্থা থেকে গৃহীত হয়নি।[৬৮]

ইংরেজ আইন ও ফরাসী আইনের উপর ইসলামী আইনের প্রভাব

ইসলামী আইন অন্য আইন দ্বারা প্রভাবিত হয় নি; বরং কিছু কিছু ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের মতে, ইংরেজ আইন ও ফরাসী আইন ইসলামী আইন দ্বারা প্রভাবিত। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের কিছু উক্তি এখানে পাঠকদের সামনে পেশ করা হলো:

ইংরেজ ঐতিহাসিক 'ওয়েলজ' তাঁর 'মানব ইতিহাসের ধারা' নামক গ্রন্থে বলেন, ইউরোপ তার প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক আইনের জন্য ইসলামের কাছে অনেক ঋণী।'[৬৯] ফরাসী ঐতিহাসিক 'সিদিও' বলেন, নেপোলিয়ান আইন মালিকী মাযহাবের গ্রন্থ খলীলের ব্যাখ্য গ্রন্থ 'আদ-দার্‌দীর' থেকেই গৃহীত।'[৭০]

ইসলামের বাণিজ্য আইনে 'মুদারাবা' বা 'কিরায' একটি বিশেষ বিনিয়োগ পদ্ধতি। ইসলামী আইনবিদদের সর্বসম্মত সংজ্ঞা মতে, এ পদ্ধতিতে এক পক্ষ ব্যবসার পুঁজি যোগান দেয়; আর অপর পক্ষ শ্রম বিনিয়োগ করে। অতঃপর ব্যবসায় লাভ হলে লাভের অংশ উভয়ে তাদের মধ্যে পূর্বে নির্ধারিত হার অনুপাতে ভাগ করে নেয়। আর লোকসান হলে পুঁজি যোগানদাতার পুঁজি যায় আর শ্রমদাতার শ্রম যায়। রাসূলুল্লাহ্ স. নবী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব থেকে আরব সমাজে মুদারাবার প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ্ তার অনুমোদন দেন, তবে তার মধ্যের ক্ষতিকর দিকগুলো বন্ধ করে দিয়ে এর উপকারিতার দিকগুলোকে আরো বৃদ্ধি করে দেন।

এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দিন বলেন,

> প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিমদের সংসর্গে আসার সাথে সাথে ইউরোপের কোন কোন দেশেও কিরাযের মাধ্যমে ব্যবসা করার রীতি প্রচলিত হয়। প্রফেসর

৬৮. *ইসলামী শরীয়তের ইতিহাস*, চায়েচ সাবাকী কর্তৃক প্রণীত, পৃ. ৩৫৩-৩৫৬; দেখুন, ড. ইউসুফ কারযাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮

৬৯. ড. ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৭০. প্রাগুক্ত

> 'আর্নেস্ট' তার 'হিস্ট্রি অব ইকোনমিক্স' গ্রন্থে লিখেছেন, '...যখন কিরাযের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করার কোন জ্ঞানই ঈসায়ী বণিকদের ছিল না, তখন মুসলিমরাই এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রচলন করেন। রোম সাগরীয় ঈসায়ী দেশ, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে লাতিনী দেশসমূহ এবং স্পেনেও এর প্রচলন হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তো কিরায বাণিজ্যিক কায়-কারবারের একটি বিশ্বজনীন রীতিতে পরিণত হয়। বিশেষ করে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ভিত্তিতে ফ্রান্সের বাদশা দশম লুই এ সম্পর্কে বিশেষ আইন প্রণয়ন করেন।[৭১]

এ বক্তব্য হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ফ্রান্স সহ ইউরোপ-আফ্রিকার অনেকগুলো দেশে ইসলামের এই বাণিজ্য আইনের প্রভাব পড়ে।

উপসংহার

মোটকথা, ইসলামী আইন পৃথিবীর যে কোন আইনব্যবস্থা থেকে উন্নত একটি ব্যাপক আইনব্যবস্থা। এ আইনব্যবস্থার পুরোটাই আল-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও ইসলামী আইনের অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত। এ আইন ব্যবস্থার কোন আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত নয়। যারা এরূপ ধারণা পোষণ করে তাদের সে ধারণা একান্তই অলীক ও কাল্পনিক। এর পশ্চাতে কোন দলীল-প্রমাণ ও ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং সত্যতা নেই। ইসলামী আইন ব্যবস্থা এমন সব বৈশিষ্ট্য সম্বলিত, যা অন্য কোন আইনব্যবস্থায় নেই। ইসলামী আইনব্যবস্থায় ইসলাম মানুষের সামনে এমন কিছু নতুন আইনের ধারা উপস্থাপন করেছে, যা ইতঃপূর্বের কোন আইন ব্যবস্থায় ছিল না।

৭১. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দিন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৩, খ. ১, পৃ. ১৮৩